কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার ঃ অব্যবস্থা ও প্রতিকার

মোঃ সহিদুল হক (প্রিন্স)
১ম বর্ষ, মাষ্টার অব ডিযোগ্রাফি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন পাতায় চোখে পড়ে প্রচুর কমপিউটার সেন্টারের বিবিধ বিজ্ঞাপন। বেশ কিছু প্যাকেজ সফটওয়্যার যেমন, WS-4, WP, LOTUS 1-2-3, dBasc III +, এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন, BASIC, PASCAL, dBASE III +, dBase IV, COBOL, ORACL ইত্যাদি শেখানোর তালিকা, পাশে থাকে নির্দিষ্ট ফী সহ সময়ের তালিকা অর্থাৎ কতদিনে এবং কত টাকায় নির্দিষ্ট কোর্সটি শেখানো হবে।

নতুন সেন্টারগুলো প্রতিযোগীতামূলক ভাবে কম ফী প্রদানের আমন্ত্রণ দিয়ে অথবা প্রচলিত তালিকার সাথে নতুন নতুন কোর্সের নাম সংযুক্ত করে টেনে নেয় প্রচুর শিক্ষার্থী, নিজেদেরকে কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিজ অঙ্গনে। কোন কোন সেন্টার পূর্বের নাম বিক্রি করে বেড়ায় অথবা ভালো প্রশিক্ষকদের নাম করে অধিক ফী আদায় করে থাকে। এ ধরনের প্রচারণা আমাদের দেশে বেশ সহজ কারণ কমপিউটার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমীত। অসংখ্য সেন্টারের ভীড়ে নূতন শিক্ষার্থীরা হয় বিভ্রান্ত, তারা দ্বিধায় ভোগে কোন্ সেন্টারে ভর্তি হলে কম ফী প্রদানে অথবা মোটামুটি ফী প্রদানে ভালো প্রশিক্ষণ নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা যাদের কাছে পরামর্শ নিতে যায় তারা হয় কোন সেন্টারের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে পক্ষপাতদুষ্ট অথবা যে সেন্টারে সে শিখেছিল তার নামটাই সর্বাগ্রে প্রস্তাব করে থাকে। কখনও কখনও এর ব্যক্তিক্রমও চোখে পড়ে আর তা আসে আফসোসের সুরে কোর্স শেষ করার পর। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষার্থী তেমন কিছু না শিখেই কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে ফেলে, ফলে একই কোর্স সমাপ্তি সার্টিফিকেটধারীদের মধ্যে ঐ কোর্স সম্পর্কে জ্ঞানের প্রচুর ব্যবধান দেখা যায়। এই প্রবণতার প্রতিরোধ প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন সকল কমপিউটার সেন্টারের জন্য প্রতিটি কোর্সের উপর নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রণয়ন এবং নূন্যতম সময় নির্ধারণ এবং এর সফল প্রয়োগ। প্রতিটি সেন্টার নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করতে বাধ্য হবে এবং শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে এবং সেই সাথে বিভিন্ন সেন্টারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যবধান কমে আসবে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কোর্সের নতুন শিক্ষার্থীদের ঐ কোর্স সম্পর্কে তো বটেই তথা কমপিউটার সম্পর্কে অনেক কম ধারণা থাকে এবং নির্দিষ্ট সিলেবাস না থাকায় শিক্ষার্থীদের অত্যল্প জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ সেন্টারই দায়সারা ভাবে কোর্স শেষ করে থাকে। সেন্টার গুলো এ শিক্ষা প্রদানকে একটি ব্যবসায়িক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। এ অবস্থার কারণ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য অনেকটা এরকম—কম সময়, কম ফী প্রদানে বেশী কিছু শেখানো সম্ভব না আর তাছাড়া প্রতিটি কোর্স, সেই কোর্স সম্পর্কে একটা গাইড লাইন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার প্রশ্ন, এ গাইড লাইন কি শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট? আর এ জন্যই আমার এ প্রস্তাবনা। প্রত্যেকটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টারকে একটি নির্বাচিত (selected) বোর্ড বা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেই বোর্ড প্রত্যেকটি কোর্সের জন্য সিলেবাস, সর্বোচ্চ ফী এবং নূন্যতম সময় নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেকটি সেন্টারকে এ সকল নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে করে সেন্টার গুলো শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ব্যবসায়িক স্বার্থে কম ফী প্রদান অথবা সিলেবাসের অতিরিক্ত শেখানোর ব্যাপারে প্রতিযোগীতা করতে পারে। এর ফলে প্রতিটি কোর্স সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নূন্যতম জ্ঞান প্রদান নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে কমপিউটারের উপর লেখা বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল।

এ সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় বিদেশী বই আমদানী করে বইগুলোকে সম্ভব হলে পুনঃমুদ্রণ বা ফটোকপি করে সকল সেন্টারে বিতরণ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রতিটি সেন্টার এ সকল বইয়ের কপি সংগ্রহে বাধ্য থাকবে। আর বাধ্য থাকবে কপি প্রতি নির্ধারিত মূল্য প্রদান করতে। এর ফলে প্রতিটি সেন্টারে একটা করে লাইব্রেরী গড়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থীগণ যেন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন সে জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে।

এ প্রচেষ্টার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট হতে হবে বিভিন্ন বিদেশী ফাউণ্ডেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা কল্পে। এতে করে কমপিউটারের উপর বিনামূল্যে বেশ কিছু বই পাওয়া যেতে পারে। যদি পাওয়া যায় তবে বিভিন্ন সরকারী গ্রন্থাগারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রাপ্ত বইগুলো সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা যেতে পারে। বিসিসি-কেও এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিসিসি-র লাইব্রেরীকে গণমাধ্যম তথা গণগ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ সেন্টারকে এ সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে হবে যে, এটা মৌলিকভাবে কোন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় বরং শিক্ষার সাথে জড়িত একটা প্রকল্প যা বাস্তবায়নে তাদের অবদান একান্ত প্রয়োজন।

দেশকে কমপিউটারায়ন এর ক্ষেত্রে কমপিউটার পরিবেশক সমিতিও বেশ বড় অবদান রাখতে পারে। আমাদের দেশে বেশ কিছু কমপিউটার পরিবেশক আছে। সমিতি কতৃক নির্ধারিত নীতিমালার অধীনে এ সকল পরিবেশক যদি প্রতি বছর ১/২ টি করে কমপিউটার বিনামূল্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমপিউটার সেন্টারকে প্রদান করে তবে কমপিউটারায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হবে এবং সেই সাথে বিস্তৃত হবে এর কল্যাণকর ভূমিকা, পূরণ হবে অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বিনামূল্যে কমপিউটার প্রদানের সংখ্যা পরিবেশকের বাৎসরিক বিক্রির উপর নির্ধারিত হতে পারে। এক্ষেত্রেও প্রাপ্ত কমপিউটারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন এন, জি, ও এবং সংস্থা (যেমন UNDP) সমূহের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য বিনামূল্যে কমপিউটারের ব্যবস্থা করা সম্ভব, যা কমপিউটারায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু প্রশাসনিক অব্যবস্থার ফলে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। আর এটা আমাদের জাতির জন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।

এভাবে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে -ধাপে হয়তো একদিন পৌঁছে যাব আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

সম্পূর্ণ হবে দেশে কমপিউটারায়ন। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন অথবা বিজ্ঞাপনে দেখা কমপিউটার এসে পড়বে হাতের মুঠোয়। সকল আশংকা, ভীতি ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে কমপিউটার হবে আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। উন্নতির শিখরে উঠবার সিঁড়িতে পা রাখবো আমরা। আর এ অগ্রগতি হবে — শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, যোগাযোগ তথা সকল ক্ষেত্রে। এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব একমাত্র সকল প্রশাসনিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের/চক্রান্তের সমূল উৎপাটনের মাধ্যমে। আর এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে আপনাকে, আমাকে, সবাইকে। সচেতন নাগরিক হিসেবে এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ দায়িত্বের অবহেলার প্রশ্ন তুলবে আগামী প্রজন্ম।•